পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

নীহারচন্দ্র মাহত শিক্ষক, বাতিকরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুরুলিয়া

বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে

একজন পড়ুয়া সে যখন বাড়িতে থাকে তখন যেরকম নিজের কাজ সে নিজে করে তেমনি ভাবেই তার পড়াশোনার দিকে মন দেওয়া উচিত। অর্থাৎ নিজের প্রতিদিনের যে পড়াশোনা সেটি খুব মনোযোগ সহকারে করা উচিত। যদি তাদের কোনও সময়ে অসুবিধা হয়, তাদের সহযোগিতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সব সময় আছেন। আমাদের মানে শিক্ষকদের প্রথম লক্ষ্য থাকে, তারা যেন খুব ভালো ভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার জন্য টেস্ট পেপারগুলি খুব ভালোভাবে লক্ষ করা উচিত। কারণ সেখানে যে প্রশ্নপত্র থাকে তার সমাধান করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। তাহলে পরীক্ষার সময় কোনও অসুবিধা হবে না। সেইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়জ্ঞানও তৈরি হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে হবে। আগে সেইভাবে ঘড়ি ধরে প্রশ্নপত্র সমাধান করার অভ্যাস থাকলে ভালো হয়। সেইসঙ্গে বলব নিজে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে সেটিরও সমাধান করতে পারলে ভালো ফল হয়। এই কাজ তখনই করতে পারবে যখন নিজের পাঠ্যবইটি ভালো ভাবে পড়বে।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলব, ঠিকমতো সিলেবাস অনুসরণ করে পড়াশোনাটি চালিয়ে যাওয়া। এখন প্রশ্নপত্রে MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকে। তার জন্য পাঠ্যবইগুলি বার বার অনুশীলন করা খুব প্রয়োজনীয়। কারণ তা হলেই ওই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। অনেক পড়ুয়াই আছে, যারা বেশিক্ষণ পড়াশোনা করতে চায় না। *এরপর দুয়ের পাতায়*

শিক্ষার স্বাধীনতা

প্রতি বছরই নিয়ম মেনে স্বাধীনতা দিবস আসে, স্বাধীনতা দিবস পালনও করা হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার মানে আমরা কতজনেই বা বুঝি? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কী আমরা সকলে স্বাধীন? সব দিক থেকে আমরা কি স্বাধীনতা পেয়েছি? আমাদের দেশে এমন অনেকেই রয়েছে যারা আজও অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে না পারাটা কি স্বাধীনতার অর্থকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে?

স্বাধীনতা দিবসের দিন চারিদিকে যখন সকলে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে ব্যস্ত থাকবেন তখন একশ্রেণির মানুষের কাছে দিনটি একটা উৎসব পালনের দিন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তারা এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে হয়তো সঠিক ভাবে কিছুই জানে না। কারণ, শিক্ষার আলো তাদের কাছ অবধি পৌঁছয়নি। আমাদের সমাজ সকলকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে আজও ব্যর্থ। ইংরেজ শাসনের হাত থেকে আমাদের দেশ মুক্তি লাভ করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আজ আর আমরা আবদ্ধ নই। আমাদের কাছে সব থেকে গর্বের বিষয় হল আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা সকলেই কি স্বাধীন? আমরা অনেকেই জানি, দেখি এই স্বাধীন দেশেও এমন অনেক মানুষই রয়েছেন যাদের দু'বেলা অন্ন জোটে না। যদিও এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, এই দেশে কি সকলের শিক্ষার স্বাধীনতা রয়েছে? উত্তর যাই হোক না কেন, চারপাশে নজর রাখলে বলতে হবে ইচ্ছে থাকলেও সকলে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে যেতে পারে না। অর্থের অভাব এর অন্যতম কারণ। রাস্তায় চলার পথে অনেক বাচ্চাকেই হোটেল বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে দেখা যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে বাচ্চাগুলোর বয়স আর কম করে ১৩-১৪ বা খুব বেশি হলে ১৫ হবে। শুধু হোটেল বা রেস্তোরাঁতেই নয়, অনেক বাড়িতেও এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কাজের লোকের ভূমিকায় দেখা যায়। আমরা শুধু দেখি। কিন্তু ক'জনের মনেই বা প্রশ্ন আসে কেন এই বয়সের ছেলেমেয়েদের হোটেল বা কারওর বাড়িতে কাজ করতে হবে? এই বয়সটা তো পড়াশোনা করার বয়স, মুক্ত আকাশে ডানা মেলে ওড়ার বয়স। ওদের কি পড়াশোনা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার অধিকার নেই?

অবশ্যই আছে। কিন্তু তারা সেই পরিবেশটা পায় কোথায়? আমরা এমন দেশে বাস করি, যেখানে আর্থিক সংকট একটা অন্যতম সমস্যা। অর্থের তাগিদে অনেক বাচ্চাকে পড়াশোনার ইচ্ছে ভুলে গিয়ে, কাজে নেমে পড়তে হয়। তা *এরপর দুয়ের পাতায়*

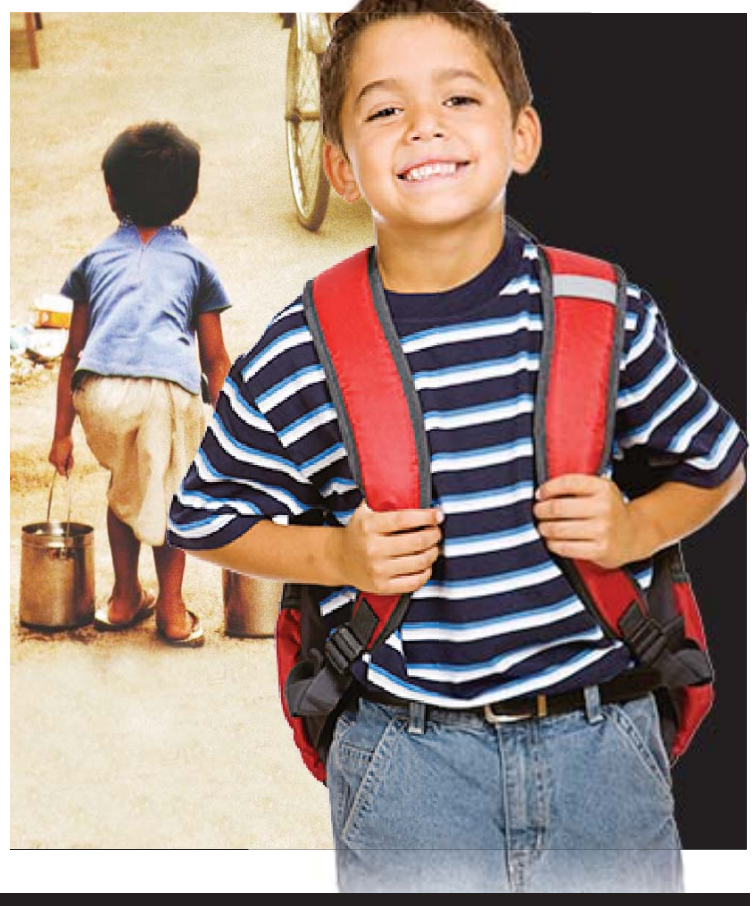

জেনারেল নলেজ: দুই, ছয় ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন: চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

শ্রেয়া চট্টোপাধ্যায় নবম শ্রেণি, অযোধ্যা হাই স্কুল, বর্ধমান

নিয়ম করে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করে নিই

দিনের বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ভালোবাসে বর্ধমানের অযোধ্যা হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া চট্টোপাধ্যায়। গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায়, ৯০০-র মধ্যে ৮৫০ নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শ্রেয়া। হবি বলতে তার কাছে গল্পের বই পড়া। ছোট থেকেই এই স্কুলেই পড়াশোনা। স্কুলে ভালো রেজাল্ট করার সুবাদে শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভালোবাসার পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছে শ্রেয়া। ভবিষ্যতে সে আরও ভালো করে পড়াশোনা করে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে চায়, সেইসঙ্গে চায় তার স্কুলের নাম উজ্জ্বল করতে।

উত্তরণ: পড়াশোনার জন্য কতক্ষণ সময় দাও?

শ্রেয়া: দিনের বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা করতেই ভালোবাসি। স্কুলে যাওয়ার আগে টিউশন নিতে যাই, স্কুল থেকে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পড়তে বসি।

উত্তরণ: পড়াশোনার জন্য তুমি কোনও টিউশন নাও?

শ্রেয়া: হ্যাঁ।

উত্তরণ: কোনও রুটিন মেনে পড়াশোনা করো?

শ্রেয়া: না সেই রকম কোনও রুটিন নেই। তবে যখন পড়াশোনা করি তখন মন দিয়ে করি। ভোরবেলা পড়াশোনা করা খুব ভালো, পড়া ভালো মনে থাকে।

উত্তরণ: মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নিজেকে কীভাবে তৈরি করছ?

শ্রেয়া: বিশেষ কিছু না। তবে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করে নিই। এরকম নিয়ম করে পড়াশোনা করলে পরীক্ষার সময় আলাদা করে পরিশ্রম করতে হয় না।

উত্তরণ: পড়া ভালোভাবে মনে রাখার জন্য কী করো?

শ্রেয়া: লিখে অভ্যাস করি। সেই সঙ্গে পাঠ্যবইগুলি ভালোভাবে পড়ি। শুধু প্রশ্নত্তোরের ওপর নির্ভর করে পড়াশোনা করি না।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

শ্রেয়া: সমস্ত বিষয় পড়তে ভালো লাগে, তবে অঙ্ক করতে বেশি ভালোবাসি।

উত্তরণ: কতক্ষণ অঙ্ক করো?

শ্রেয়া: তিন-চার ঘণ্টা।

উত্তরণ: পড়াশোনার বাইরে?

শ্রেয়া: গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি। কখনও পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে গল্পের বই পড়ি। আমার প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়।

উত্তরণ: তোমার কোনও বিশেষ স্বপ্ন আছে?

শ্রেয়া: ভবিষ্যতে আইআইটি-তে পড়ার ইচ্ছে আছে।

উত্তরণ: অনুপ্রেরণা কে?

শ্রেয়া: বাবা-মা। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

উত্তরণ: তোমার জীবনে আরও সফলতা লাভ করো।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), বিদিশা রায়চৌধুরী (অসম), সালমা আহমেদ, বিপাশা চক্রবর্তী

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

তাদের উদ্দেশে বলব, শিক্ষকদের নির্দেশিকা মেনে পড়াশোনা করলে কম পড়েও ভালোভাবে রেজাল্ট করতে পারবে। কারণ মাধ্যমিক একজন ছাত্রছাত্রীর প্রথম ধাপ সেটি মনে রাখা উচিত।

একজন পড়ুয়া যদি নিয়ম করে স্কুলে আসে তাহলে তার গৃহশিক্ষকের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়, ইংরেজি শিক্ষার ওপর তাদের একটি ভীতি রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ইংরেজি বিষয়টিকে আরও সড়গড় করার জন্য গৃহশিক্ষকের কাছে অবশ্যই তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারো।

ছাত্রজীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব খুবই বেশি। তবে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে সেইভাবে খেলাধুলার শিক্ষক নেই বা নতুন করে নিয়োগ করা হয়নি। তাদের যে খেলাধুলার ক্লাস থাকে, তখন তাদের শরীরশিক্ষার ক্লাস করানো হয়। তারা নিজেরাও খেলাধুলা করতে পারে। পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়েও তাদের সচেতন করা প্রয়োজন।

আলোচনা

ভারী ব্যাগের দৌলতে নাজেহাল স্কুল পড়ুয়ারা

ছোটবেলাটা কি হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই ভারী ব্যাগ নিয়ে বাবা-মায়ের হাত ধরে স্কুল বাসের লাইনে। আবার ওইভাবে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরত। দিনের বেশিরভাগ সময় ভারী ব্যাগ টেনে স্কুল আর টিউশন এইভাবে দিন কাটছে শিশুদের। অভিভাবকদের অভিযোগ, আজকাল বাচ্চাদের ওজনের থেকে বেশি ভারী তাদের স্কুলের ব্যাগ। আর সেই ভারী ব্যাগ বহন করতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা হয় বাচ্চাদের। অনেক সময় এই ভারী ব্যাগের দৌলতে পিঠে ব্যাথার সমস্যাতেও ভোগে কচিকাঁচারা। স্কুল থেকে ফিরে এই কচিকাঁচাগুলিকে ফের টিউশন ক্লাসে যেতে হয়। শুধু টিউশন ক্লাসই বা কেন নাচ, গান, আঁকা, ক্যারাটে কোনটা শেখে না বাচ্চারা। ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই ভারী হতে থাকে তাদের ব্যাগও। তাই দিনের শেষে পাওনা ক্লান্তি। উঁচু ক্লাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তাদের ব্যাগের ওজনও। অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানকে পড়াশোনার জন্য এভাবে খাটতে দেখে খুশি হন বাবা-মায়েরা। কিন্তু, এই ভারী ব্যাগ দীর্ঘক্ষণ কাঁধে থাকার ফলে ক্ষতি হচ্ছে বাচ্চার শরীরের। দেখা গেছে, ভারী স্কুল ব্যাগ বহন করতে ভয় পায় বাচ্চারা। আর সেই কারণেই অনেক সময় স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করে তারা। আবার যে সব বাচ্চারা এক কাঁধে ব্যাগ নেয় তাদের শরীরের একদিকের উপর বেশি চাপ পড়ে। যার ফলে বাচ্চাদের মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক গতি হ্রাস পায়। বেশিক্ষণ ধরে ভারী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে থাকার ফলে বাচ্চাদের মাসল, লিগামেন্ট ও হাঁটুর উপর খুব চাপ পড়ে। আবার অনেক সময় ভারী ব্যাগ নেওয়ার ফলে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে বাচ্চারা। চলাফেরা করতে তাদের কষ্ট হয়। এতে বাচ্চাদের স্বাভাবিক গ্রোথ নষ্ট হয়। হাতের জোরও কমে যেতে পারে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বাচ্চারা।

বাচ্চাদের এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারেন অভিভাবকরা:

সঠিক ব্যাগ নির্বাচন করা:

ব্যাগ কেনার সময় বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ব্যাগের কাঁধে যেন প্যাড দেওয়া থাকে। এতে কাঁধের উপর বেশি চাপ পড়ে না। ব্যাগ নেওয়ার সময় বাচ্চা যাতে খুব বেশি সামনের দিকে ঝুঁকে না যায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর ফলে যদি ব্যাগ খুব বেশি ভারী হয় তাহলে বড় ব্যাগ নেওয়া দরকার। এতে ভার খুব একটা লাগে না। ব্যাগ কেনার সময়ে অনেকেই খরচের কথা ভেবে পিছিয়ে যান। কিন্তু বাচ্চার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে একটু ভালো ব্যাগ কেনার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ব্যাগের মধ্যে যেটুকু জিনিস প্রয়োজন সেটাই দিন। তার থেকে বেশি জিনিস একেবারেই দেবেন না। এছাড়া, খাতার পরিমাণ কমাতে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে খাতা নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তেমন হলে একটা মাত্র খাতা নিয়ে যেতে বলুন বাচ্চাকে। সেই খাতার পাতা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাতে সব বিষয়ের নোটস নিলেই হয়। এরপর বাড়িতে এসে আলাদা আলাদা করে অন্য খাতায় লিখে নিলেই হবে। এর ফলে বেশি খাতা স্কুলে নিয়ে যেতে হবে না।

তবে এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকেও বিশেষ নজর দেওয়ার দরকার। স্কুলে যদি প্রতিটি বাচ্চার ক্ষেত্রে আলাদা লকার সিস্টেম করা যায়, তাহলে ভালো হয়। যেখানে পড়ুয়ারা কিছু রুটিন অনুযায়ী বই খাতা রেখে যেতে পারবে। সেইসঙ্গে লেখার ব্যাপারে একটি খাতার মধ্যে ভাগ করে যদি স্কুলের কাজ করানো যায়, সেইগুলি পরে বাড়ি এসে নির্দিষ্ট সময় বিষয় অনুযায়ী কপি করে নিলে ভালো। তাহলে ভারী ব্যাগ টানার থেকে হয়তো স্কুল পড়ুয়াদের একটু রেহাই মিলতে পারে।

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা ‘রোল নং ওয়ান’ বিভাগে যোগ দিতে পারো।
ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

শিক্ষার স্বাধীনতা

প্রথম পাতার পর

না হলে তাদের সংসার ঠিকমতো চলবে না। কারণ পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। এমন অনেক পরিবারই রয়েছে, যাদের একবেলা খাবার জোগাড় করে খেতে গিয়ে অন্যবেলার খাবারের সন্ধান করতে হয়। অগত্যা তাঁরা ভাবেন গুচ্ছের পড়াশোনা করে কী হবে? তার থেকে রোজগার করলে সংসারে দুটো পয়সা দিতে পারবে। তাই কোনও কিছু না ভেবে পরিবারের ছোট সদস্যকে রোজগারের পথে বাড়িয়ে দেয়। আর সেও ছোট বয়সেই হাতে টাকা পাওয়ার আনন্দে পড়াশোনার স্বাদটাই ভুলে যায়। এরজন্য সবার আগে বাচ্চার মা-বাবাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সংসারের অভাব দূর করার জন্য কিছু রোজগার হবে বলে বাড়ির বাচ্চাকে স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে পাঠিয়ে দেবো এইরকম মানসিকতা থেকে বেরোতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু সামাজিক পরিকাঠামো নয় আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করার প্রয়োজনও রয়েছে।

আবার কিছু অসাধু লোক থাবা বসায় অভাবী পরিবারগুলোর উপর। নজর পড়ে পরিবারের ছোট ছোট সদস্যগুলির উপর। বাড়ির লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে যেভাবে হোক বাচ্চাটাকে একবার বাড়ির বাইরে বার করতে পারলেই হল। একবার যদি বোঝানো যায় তাদের ছেলে বা মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে কাজে লাগিয়ে দেব, আর সেই সদস্য মাসে মাসে মোটা টাকা রোজগার বাড়িতে পাঠাবে, তাহলে তো আর কথাই নেই। এমন ঘটনা অনেক ঘটে। তাকে কলকাতায় এনে সরাসরি পাচার করে দেওয়া হয়। আর একবার পাচার হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার কোনও রাস্তা নেই। অসাধু লোকটা মোটা টাকা নিয়ে চলে যায়। অথচ পরিবারটি যেমন অভাবে ছিল তেমন অভাবেই থেকে যায় উপরন্তু নিজের সন্তানকে হারানোর কষ্ট তাদের সারা জীবন ভোগ করতে হয়।

আইন অনুযায়ী, ১৪ বছরের নীচে শিশু শ্রমিক থাকা অপরাধ। ১৯৮৬ সালে আইন প্রণয়ন করে বলা হয়েছিল শিশু শ্রম ঘোরতর অপরাধ। এর কিছুদিন পর পুলিশের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল সমস্ত জায়গায় কড়া নজর রাখতে হবে। যদি ১৪ বছরের নীচে কোনও শিশুকে কাজ করতে দেখা যায়, তাহলে তাকে নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। শিশু শ্রম আটকাতে অনেক আইনই হয়েছে। কিন্তু আদৌও কি শিশুশ্রম আটকানো সম্ভব হয়েছে?

অনেক বাড়িতেই দেখা যায় মায়ের সঙ্গে তার ছোট বাচ্চাটিও অন্যের বাড়িতে কাজ করছে। এমনটা কেন হবে? যেই বাড়িয়ে এমন ঘটনা ঘটে সেই বাড়ির মানুষকেও সচেতন হতে হবে। চোখের সামনে এমন বাচ্চাকে কাজ করতে দেখলে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে। ভাবতে হবে তার ছেলে-মেয়ে তো এই বয়সে স্কুলে গেছে, পড়াশোনা করেছে তাহলে ওই বাচ্চাটি কী অপরাধ করল? হোটেল বা রেস্তোরাঁতে ১৪ বছরের নীচে কোনও বাচ্চাকেই কাজে রাখা উচিত নয়। যাঁরা রাখেন তাঁরাও তো কম অপরাধী নন!

আমাদের দেশের প্রত্যেক শিশু যাতে শিক্ষার সুযোগটুকু পায় তার জন্য আমাদেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন রয়েছে আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর। যে সমস্ত বাচ্চা সংসারের অভাব দূর করতে স্কুলে না গিয়ে কাজ করতে যায় তাদেরও তো স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে। ওর বয়সি অন্য বাচ্চাকে যখন স্কুলে যেতে দেখে তখন ওর ও তো কষ্ট হয়। সত্যি বড়ই বিচিত্র এই দেশ! কোনও এক পরিবার তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারে, আবার কোনও এক পরিবার অভাবের তাড়নায় তার সন্তানকে রোজগারের উদ্দেশ্যে কাজে পাঠায়। তাহলে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হলাম কী করে?

১৫ আগস্টের একদিন কী দু’দিন আগে অনেক ছোট ছোট বাচ্চাকে রাস্তায় পতাকা বিক্রি করতে দেখা যায়। কারণ এটা তাদের কাছে রোজগারের একটা উপায়। এরা এইভাবেই আনন্দ পায়। এরা হয়তো জানেও না স্বাধীনতার আসল মানে কী! তার কী কী স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু আমরা যারা জানি তাদের কি ‘আমরা স্বাধীন’ কথাটা বলতে একটুও বাধবে না?

শর্মিলা চন্দ্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

জেনারেল নলেজ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর ১৫ আগস্ট তারিখটি ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ইংরেজ সরকারের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ভারতবাসীর মনে যে ক্ষোভের আগুন জ্বেলেছিল, তার ফলেই সংঘটিত হয়েছিল বিভিন্ন আন্দোলন। যা ইংরেজকে এটা বুঝিয়েছিল যে তাদের অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে আসছে। নীল চাষিদের ওপর অন্যায়ভাবে নীলচাষ করার জন্য অত্যাচার থেকে শুরু করে জালিওয়ানাবাগের ময়দানে অতর্কিতে বহু মানুষকে হত্যা করার মতো ঘটনা সারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য মরিয়া করে তুলেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধানত অহিংস, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিভিন্ন চরমপন্থী গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সহিংস আন্দোলনের পথে পরিচালিত এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং থেকে ক্ষুদিরাম বসু, এমনকী মেদিনীপুরের বিধবা মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকরা তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মনে এই চেতনা জাগ্রত করতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। ইংরেজদের শাসন, শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার মেনে নেওয়ার দিন শেষ। সমগ্র দেশবাসীকে জোটবদ্ধভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সোচ্চার করেছিলেন তাঁরা। বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতা।

এই সময়ে সারা দেশ জুড়ে তখন চলছে অরাজকতা। ইংরেজদের প্রতি বিক্ষোভের আগুন। আর অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের মানে ইংরেজদের সরকারি অর্থভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় সদ্য-নির্বাচিত লেবার সরকার অনুভব করে, ক্রমাগত অস্থির হয়ে ওঠা ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যাবে না এবং এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্যও পাওয়া অসম্ভব হবে। তাছাড়া স্থানীয় সেনাবাহিনীও যে এই কাজে নির্ভরযোগ্য হবে না, তাও সরকার অনুভব করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ঘোষণা করেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদন করতে চলেছে। অবশ্য ভারতের নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে আনেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ক্রমাগত তর্কবিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা অন্তর্বর্তী সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে বলেন সমগ্র ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক ডোমিনিয়নে বিভক্ত করা হবে এবং এই দুই ডোমিনিয়ন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করবে। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ভীমরাও রামজি আম্বেদকর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভারতে ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে যুক্ত হয়; পঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে ভারতীয় গণপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে নবীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক আবেগদীপ্ত ভাষণে বলেন, 'মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, সমগ্র বিশ্ব যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, ভারত জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায়।' ভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে তিনি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

প্রতি বছর ১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় চ্যানেল দূরদর্শনের সাহায্যে সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীগুলিতেও পতাকা উত্তোলন-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অন্যান্য শহরগুলোতেও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন। নানা বেসরকারি সংস্থাও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুল-কলেজেও পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজপোশাক পরে শোভাযাত্রা করে।

এই দিনটি ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কাছে যেমন গর্বের, তেমনই মনে রাখার সেই বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে।

স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

English Grammar

Auxiliary Verbs (সাহায্যকারী ক্রিয়া)

The verbs that are used to from the tenses, moods, voices etc. of other verbs are called Auxiliary Verbs.

(মূল Verb-এর tense, mood এবং voice পরিবর্তন করার জন্য যেসব verb সাহায্য করে তাদের Auxiliary Verb বলা হয়।)

ইংরাজি ক্রিয়া প্রকরণে এইসব Verb গুলি ব্যবহার হয়-be, have, do, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought, used, need, dare..ইত্যাদি।

এই Verb গুলিকে Anomalous বা Special Verbও বলা হয়। কারণ তাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য verb-এর নেই।

1) এদের প্রশ্নগঠনে ব্যবহার করা যায়। যেমন: Do you sing? Can you swim? Have you a pencil? Must you do it? Shall we sit down? Ought we not to help him?

2) এদের সঙ্গে n't যোগ করে না-সূচক sentence করা যায়। যেমন: I can't do it. Don't you go there. Won't you come please?

3) কোনও ক্রিয়াসূচক পদ সমষ্টিকে বোঝাতে এদের ব্যবহার করা হয়। যেমন:

Does he regularly teach you?

—Yes, he does (He does regularly teach us).

Can you swim across the river?

—Yes, I can. (I can swim across the river)

4) এদের সাহায্যে Question-tagও করা যায়। যেমন: You come here daily, don't you?

You are proud, aren't you?

এবার আমরা জেনে নেব এইসব সাহায্যকারী verb গুলি প্রত্যেকটি আলাদাভাবে কী কী কাজ করে:

a) Verb be

I) Continuous Tense গড়তে সাহায্য করে। যেমন: I am coming. They will be swimming.

ii) Passive voice গঠন করতে সাহায্য করে।

Active: He writes poems.

Passive: Poems are written by him.

iii) be verb এর পরে infinite form এ verb ব্যবহার করা হয়। You are to welcome the guests.

অনেক সময় আদেশ দেওয়ার জন্য be verb এর পরে infinite ব্যবহার হয়। You are to clean the room at once. The soldiers are to attack the enemy immediately.

b) verb Have

Perfect tense গঠন করার জন্য have verb এর present এবং past form ব্যবহার করতে হয়।

1) Present Perfect: I have seen him.

2) Past perfect: I had been there before you.

3) Future Perfect: I shall have done the task before evening.

4) Present Perfect Continuous: He has been studying since morning.

5) Past Perfect Continuous: It had been raining for two hours before the sun came out.

ii) বাধ্যবাধকতা বোঝাবার জন্য infinite (to...) এর আগে have verb এর Auxiliary হিসাবে ব্যবহার হয়।

যেমন: তোমাকে যেতেই হবে— You have to go.

দরকার হলে দেশের জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে-If needed, we have to lay down our lives for our country.

C) verb Shall, Should, will, Would

I) Shall is used in the First Person and Will in the Second and Third persons to indicate Simple Future Tense:

Shall: I shall go to market tomorrow.

We shall go to school at 10 a.m.

Will: You will accompany me to the cinema.

He/She will learn much from study.

ii) Second এবং Third Person এ Shall ব্যবহার হয় আদেশ, প্রতিশ্রুতি এবং শাসন বোঝাবার জন্য। যেমন: He shall do it now (এখন তাকে এটা করতে হবে)।

iii) যাকে সম্বোধন করা হয় তার অভিমত বা উপদেশ জানার জন্য shall ব্যবহার করা হয়। যেমন: Which pen shall I use? (কোন কলমটি আমি ব্যবহার করব?)

iv) বক্তার ইচ্ছা বোঝাতে Will first person এও ব্যবহার হয়।

v) আবার প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা বোঝাতেও First Person-এ will ব্যবহার হয়। যেমন: I shall take you to the station. (আমি তোমাকে স্টেশনে নিয়ে যাব) ইচ্ছা বোঝাচ্ছে এখানে।

vi) Shall এবং will-এর past form হিসাবে should এবং would ব্যবহার করা হয়। যেমন: I hoped I should obtain first class marks.

vii) Should উচিত অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন: We should obey our parents. (আমাদের পিতামাতাকে মেনে চলা উচিত।)।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

আলোর প্রতিসরণ

দুটি মাধ্যমের বিভেদতলের মধ্য দিয়ে আলো যদি বিভেদতলের সঙ্গে আনতভাবে এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করে, তবে এই বিভেদতলে আলোক রশ্মির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলা হয়।

ধরা যাক, আলোক রশ্মি বায়ু মাধ্যমের থেকে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করল। বায়ু মাধ্যম ও কাচ মাধ্যমের বিভেদ তল হল প্রতিসারক তল। বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আপতিত রশ্মি বিভেদ তলের আপতন বিন্দুতে অভিমুখ পরিবর্তন করে প্রতিসৃত রশ্মি হয়ে গমন করে। আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের ওপর কাল্পনিক উলম্ব রেখাকে অভিলম্ব বলা হয়। আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে যথাক্রমে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ বলা হয়।

লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ:

আলোক রশ্মি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে (যেমন বায়ু থেকে কাচে) প্রবেশ করলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যায়। এক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হয়।

ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ:

আলোক রশ্মি যদি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে (যেমন কাচ থেকে বায়ুতে) প্রবেশ করে তবে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের থেকে দূরে সরে যায়। এক্ষেত্রে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয়।

প্রতিসরণের সূত্র: আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে।

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিসারক তলের উপর অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। (২) আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত ধ্রুবক হয় এবং এই ধ্রুবকের মান মাধ্যম দুটির প্রকৃতি ও আপতিত আলোকবর্ণের ওপর নির্ভর করে। এই সূত্রটিকে বিজ্ঞানী স্নেলের নামানুসারে, 'স্নেলের সূত্র' বলা হয়।

প্রতিসরাঙ্ক: আপতন কোণ = i এবং প্রতিসরণ কোণ = r হলে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, Sini/Sinr = μ (গ্রিক অক্ষরে মিউ') = ধ্রুবক

এই μ-কে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়।

প্রতিসরাঙ্কের মান (i) সংশ্লিষ্ট মাধ্যম দুটির প্রকৃতি এবং (ii) আপতিত আলোকবর্ণের ওপর নির্ভর করে। আপতন কোণের মান যাই হোক না কেন, আপতিত আলোর বর্ণ (অর্থাৎ কম্পাঙ্ক) এবং মাধ্যম দুটি অপরিবর্তিত থাকলে প্রতিসরাঙ্কের মান ধ্রুবক থাকে।

প্রতিসরাঙ্কের কোনও একক নেই। এটি একটি মাত্রাহীন রাশি।

লম্ব আপতন: যদি আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অপর এক মাধ্যমের বিভেদ তলের ওপর লম্বভাবে আপতিত হয়, তাহলে i=0 হয়, সেক্ষেত্রে স্নেলের সূত্রানুসারে μSinr = Sin0 = 0 বা, r=0 [বাস্তবে μ এর মান শূন্য হতে পারে না]

সুতরাং, দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে আলোকরশ্মি লম্বভাবে আপতিত হলে তা দিক

পরিবর্তন না করে দ্বিতীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে যায়, অর্থাৎ কোনও প্রতিসারক তলের ওপর লম্বভাবে আপতিত রশ্মির ক্ষেত্রে,

μ=Sini/Sinr সম্পর্কটি প্রযোজ্য নয়।

আমরা জানি, আলোর গতিপথ প্রত্যাবর্তনশীল। অর্থাৎ আলো একই পথে ফিরে আসতে পারে। সুতরাং কোনও আলোকরশ্মি কাচ মাধ্যম থেকে এসে বিভেদ তলের আপতন বিন্দুতে r কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণের পর বায়ু মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ হবে i।

এক্ষেত্রে কাচ μ বায়ু = Sinr/Sini (এখানে =কাচ মাধ্যমের সাপেক্ষে বায়ু মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক)

অতএব, কাচ μ বায়ু x বায়ু μ কাচ =Sini/SinrxSinr/Sini = ১

আবার, যখন কোনও আলোকরশ্মি শূন্যস্থান থেকে অন্য কোনও মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়, তখন আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে ওই মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। শূন্যস্থানের প্রতিসরাঙ্ক 1 ধরা হয়। বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক শূন্য স্থানের প্রতিসরাঙ্কের প্রায় সমান।

সাধারণভাবে কোনও মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলতে বায়ু মাধ্যমের সাপেক্ষে ওই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বোঝায়।

প্রতিসরণের জন্য আলোকরশ্মির কৌণিক চ্যুতি: প্রতিসরণের সময় আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তনকে তার চ্যুতি বলা হয়। প্রতিসরণের সময় আলোকরশ্মির মাধ্যমের বিভেদ তলের উপরিস্থ আপতন বিন্দু থেকে দিক পরিবর্তন করে। আপতিত রশ্মির অভিমুখ এবং প্রতিসৃত রশ্মির অভিমুখের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় সেই কোণই রশ্মির চ্যুতির পরিমাপ নির্দেশ করে।

প্রিজম: পরস্পরের সঙ্গে আনত দুটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনও স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমের অংশ বিশেষকে প্রিজম বলা হয়।

প্রতিসারক তল: পরস্পরের সঙ্গে আনত যে দুটি সমতল দ্বারা প্রিজম গঠিত হয়, তাদের প্রতিসারক তল বলা হয়।

প্রান্তরেখা: প্রিজমের প্রতিসারক তল দুটি যে সরলরেখায় মিলিত হয় তাকে প্রিজমের প্রান্তরেখা বলা হয়।

প্রতিসারক কোণ: প্রিজমের প্রতিসারক তল দুটি যে কোণে আনত থাকে সেই কোণকে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ বলা হয়।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

মেন্ডেলের তত্ত্ব ও একসংকর জনন

বিজ্ঞানী মেন্ডেল মটরগাছের সাত জোড়া পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়েছিলেন এবং তাদের রেসিপ্রোকাল ক্রস সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে F3 জনু পর্যন্ত পরীক্ষা করে মটর গাছের বংশগতি সংক্রান্ত যে তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন, তাকেই 'মেন্ডেল তত্ত্ব' বলে।

তিনি প্রথমে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে পরস্পর বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি (বিশুদ্ধ লম্বা ও বিশুদ্ধ খর্ব) উদ্ভিদের মধ্যে পরাগমিলন ঘটান, একে একসংকর জনন বা মোনোহাইব্রিড ক্রস বলে। তিনি স্ত্রী জনিতৃরূপে চিহ্নিত উদ্ভিদের উভলিঙ্গ ফুলের মুকুল অবস্থাতে কাঁচির সাহায্যে অপরিণত পুংকেশরগুলিকে (পরাগরেণু পরিণত হওয়ার আগেই) অপসারিত করেন। এর ফলে ওই ফুলটির স্বপরাগযোগ সম্ভব হয় না এবং কাঙ্ক্ষিত ইতর পরাগযোগ ঘটানো সম্ভবপর হয়। এভাবে উভলিঙ্গ ফুল থেকে পুংকেশরের অপসারণকে ইমাসকুলেশন বলে। এছাড়াও গরম ও ঠান্ডা জল, অ্যালকোহল, সাকশন পদ্ধতি বা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (NAA, 2, 4-D) প্রয়োগেও ইমাসকুলেশন করা যায়।

মেন্ডেল দু-ভাবে, একবার লম্বা উদ্ভিদের পরাগরেণু খর্ব উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করে পরাগমিলন ঘটান ও পরের বার খর্ব উদ্ভিদের পরাগরেণু লম্ব উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করে পরাগমিলন ঘটান। প্রতিক্ষেত্রে একইপ্রকার ফলাফল পান। এইপ্রকার ক্রসকে রেসিপ্রোকাল ক্রস বলে।

মেন্ডেলের সাফল্যের কারণ:

ক) মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষায় বিশুদ্ধ ও স্বপ্রজননশীল মটর উদ্ভিদ নির্বাচন করেছিলেন।

খ) তাঁর নির্বাচিত বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

গ) তিনি সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলির, একটি করে পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যর উপর পরীক্ষা করেছিলেন।

ঘ) মেন্ডেলের নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটিই একেকটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঙ) নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যগুলির নিয়ন্ত্রক জিনগুলির মধ্যে লিংকেজ পাওয়া যায় না।

চ) দক্ষ উদ্ভিদ-প্রজননবিদ মেন্ডেল সাফল্যের সাথে মটর গাছের ইমাসকুলেশন করেন ও সংকরণে নির্বাচিত উদ্ভিদগুলিতে রেসিপ্রোকাল ক্রস করেছিলেন।

ছ) তিনি প্রতিটি ফলাফলকে উপযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

মেন্ডেলের পরীক্ষা এবং মেন্ডেলের সূত্র: মেন্ডেল তাঁর একসংকর জননের পরীক্ষায় একটি বিশুদ্ধ লম্বা (TT) (লম্বা বৈশিষ্ট্যর জিন T) মটর উদ্ভিদের সাথে একটি খর্ব (tt) (খর্ব বৈশিষ্ট্যর জিন t) মটর উদ্ভিদের ইতর পরাগযোগ ঘটান। তিনি স্ত্রী জনিতৃ হিসাবে

নির্বাচিত উদ্ভিদের পুংকেশর অপসারণ করেন, যাতে স্বপরাগযোগ না হয়।

ফলাফল:

ক) প্রথম অপত্য জনুতে সবকটি উদ্ভিদ ছিল লম্বা (Tt)।

খ) প্রথম অপত্য জনুর উদ্ভিদের মধ্যে স্বপরাগযোগের ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় অপত্য জনুর উদ্ভিদগুলির ৭৫% ছিল লম্বা ও ২৫% ছিল খর্ব। অর্থাৎ লম্বা ও খর্ব উদ্ভিদের অনুপাত ৩:১ (ফিনোটাইপিক অনুপাত)।

গ) দ্বিতীয় জনুর উদ্ভিদগুলিতে তিনি লক্ষ করেন, খর্ব উদ্ভিদগুলি সর্বদাই খর্ব উদ্ভিদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ তারা বিশুদ্ধ (tt) এবং লম্বা উদ্ভিদগুলির মধ্যে দু-প্রকার জিনোটাইপের উদ্ভিদ পান, যার ১/৩ অংশ লম্বা উদ্ভিদ, এরা শুধু লম্বা উদ্ভিদই সৃষ্টি করে অর্থাৎ বিশুদ্ধ (TT) এবং অন্য ২/৩ অংশ লম্বা উদ্ভিদের তৃতীয় জনুতে লম্বা ও খর্ব দু-প্রকার উদ্ভিদই ৩:১ অনুপাতে জন্ম নেয়, অর্থাৎ এই ২/৩ অংশ উদ্ভিদ সংকর লম্বা (Tt)। সুতরাং দ্বিতীয় জনুতে বিশুদ্ধ লম্বা (TT), সংকর লম্বা ও বিশুদ্ধ বেঁটে উদ্ভিদের জিনোটাইপিক অনুপাত ৩:২:১।

মেন্ডেলের এই পরীক্ষা থেকে আমরা যা জানতে পারি তাই হল পৃথকীভবনের সূত্র। এই সূত্রানুযায়ী, একজোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যর বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে ফ্যাক্টর দুটি একত্রিত হলেও তারা কখনও মিশে যায় না, পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্যামেট গঠনকালে ফ্যাক্টর দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। মেন্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্রের সিদ্ধান্তে আসা যায়।

প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্রানুযায়ী, একজোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যর বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায় তাকে প্রকট ও যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায় না তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

প্রানীদের ক্ষেত্রে মেন্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা:

একটি বিশুদ্ধ কালো (BB) স্ত্রী গিনিপিগের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সাদা (bb) পুরুষ গিনিপিগের সংকরায়ণে প্রথম অপত্য জনুতে সব অপত্য কালো (সংকর কালো Bb) হয়। এক্ষেত্রে কালো বর্ণের জন্য দায়ী জিন 'B' হল প্রকট ও সাদা বর্ণের জন্য দায়ী জিন 'b' হল প্রচ্ছন্ন। প্রথম অপত্য জনুর একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সংকর কালো গিনিপিগের সংকরায়ণে দ্বিতীয় অপত্য জনুতে তিনভাগ কালো ও একভাগ সাদা গিনিপিগ জন্মায় অর্থাৎ ফিনোটাইপিক অনুপাত হল, কালো:সাদা = ৩:১ এবং জিনোটাইপিক অনুপাত হল বিশুদ্ধ কালো:সংকর কালো:বিশুদ্ধ সাদা = ১:২:১।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ইতিহাস

ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ও আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে কয়লাখনি, চা-বাগান, কুলির কাজ নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ব্রিটিশ সরকার তখন রাজস্বের লোভে আবাদি জমির মালিকানা জমিদারদের হাতে দেয়। এই জমিসংক্রান্ত অসন্তোষের মাঝে জমিদাররা মিলে গোদাবরীর উপত্যকায় অরণ্যচারী রুম্পা উপজাতির উপর কর ধার্য করলে, প্রতিবাদে শুরু হয় রুম্পা বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব: বিদ্রোহ শব্দের অর্থ হল বিশেষ ভাবে হিংসা করা। কোনও একটি বিশেষ কারণে কোনও জাতির ক্ষোভ বা রাগ জমতে জমতে একসময় বিদ্রোহের আকার নেয়। যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ। আর কোনও বিদ্রোহের কারণই হল তার অভ্যুত্থান, অর্থাৎ কোনও কিছুর প্রতিবাদ থেকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা। যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান। এবার জানা যাক বিপ্লব কথার অর্থ। বি অর্থাৎ বিশেষ আর প্লব মানে লাফ। বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থানের গণ্ডি পেরিয়ে বিপ্লবের জন্ম হয়।

চুয়াড় বিদ্রোহ: মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কিছু অংশের আদিবাসীদের বলা হত চুয়াড়, এরাই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে ক্রমে তা ধলভূম, সিংভূম, মানভূম, ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

চুয়াড়দের দাবি ছিল বন ও বন্যসম্পদ রক্ষা করা। ইংরেজরা তাদের জমি কেড়ে নিচ্ছিল, তাই দুর্জন সিংহ-র নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা রায়পুরের ৩০টি গ্রাম দখল করে, শালবনির সরকারি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। অচল সিংহের নেতৃত্বে বাগিড়ীর লায়েক সম্প্রদায়ের লোকেরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে।

এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকারকে মেদিনীপুর থেকে পুলিশ আনতে হয়েছিল, শুধু তাই নয় সরকার তাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতেও চেয়েছিল, কিন্তু চুয়াড়রা অটুট থেকে তাদের বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইংরেজরাও এই বিদ্রোহের যৌক্তিকতা স্বীকার করে সরকারকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করে।

রংপুর বিদ্রোহ: প্রজা এবং জমিদাররা ঠিকমতো রাজস্ব দিতে না পারলে ইংরেজরা তাদের উপর অত্যাচার চালাত। এই বিদ্রোহেই শেখ নুরুলুদ্দিন ও ধীরাজরঞ্জনের নেতৃত্বে রংপুরের শাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কুচবিহার ও দিনাজপুরে রংপুর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। 'দিংখরচা' বা চাঁদার মাধ্যমে এই বিদ্রোহের খরচ চালানো হত। এই যুদ্ধে জমিদারের কাছারি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, খাজাঞ্চি লুট করে বন্দি কৃষকদের মুক্ত করা হয়।

কোল বিদ্রোহ: এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের জমির ইজারা লাভ ও খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার। ১৮৩১ সালে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুন্ডা, হো সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে। বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুণ্ডা প্রমুখ ছিল এই বিদ্রোহের নেতা। এই বিদ্রোহের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গণ অভ্যুত্থান। তারা গ্রামে গ্রামে তির ধনুক বিলি করত আর মহাজনদের হাতে পেলে ঠাকুরের সামনে তাদের বলি দিত। তারা ক্রমেই হিংস্র হয়ে ওঠে।

ইংরেজরা কলকাতা, বেনারস, পটনা থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে আসে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য। প্রায় ২ বছর এই বিদ্রোহ চলে। পরে ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে প্রায় ১০,০০০ বিদ্রোহী মারা যায় এবং বিদ্রোহ শেষ হয়। তবে অনেকে মনে করে সুযোগ্য নেতার অভাব, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা ও তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবও বিফলতার কারণ। তবে সরকারও কিছু কিছু দাবি মেনে নেয় যেমন— দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি বলে একটি এলাকা কোলদের নামে নির্দিষ্ট করা হয়। কোলদের নিজস্ব দাবি ও আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ: চিরস্থায়ী প্রথার পরে যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল তাদের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম। মূলত অরণ্যের অধিকার ও 'দামিন-ই-কোহ' বা ঈশ্বরপ্রদত্ত নিষ্কর জমির অধিকার নিয়ে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিহারের রাজমহল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছিল। এর বিশেষত্ব হল সব শ্রেণির মানুষ মিলে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে, তাই অনেকে একে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাতও বলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার, মহাজন ও ইংরেজরা মিলে সাঁওতালদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। তাদের জমি কেড়ে নেয়, রাজস্ব অনাদায়ে ৫০%-৫০০% হারে সুদ নিতে বাধ্য করে মহাজনদের কাছ থেকে, এমনকী মহিলাদের সম্মানও নষ্ট করে। এইসব কারণে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে ২০,০০০ সাঁওতাল মিলিত ভাবে বিদ্রোহ শুরু করে। লর্ড ডালহৌসির আমলে কঠোর হাতে গণহত্যা চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

এই বিদ্রোহ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যায় না, কারণ ইংরেজরা সাঁওতালদের জন্য সাঁওতাল পরগনা নির্দিষ্ট করে এবং তারা সাবধান হয় যে অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ালে যে কোনও মানুষই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভূগোল

বায়ুমণ্ডলের তাপ, উষ্ণতা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

সাধারণত কোনও স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে সেই স্থানের বায়ুর উষ্ণতার উপর। আর বায়ুর উষ্ণতা নির্ভর করে সূর্যরশ্মির উপর।

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল: পৃথিবীতে সূর্যরশ্মির খুব সামান্য অংশই ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। একে বলে সূর্যের তাপীয় ফল বা আগত সৌরকিরণ।

উত্তাপের সমতা: সূর্যতাপে সকালে ভূপৃষ্ঠ গরম হয় ও রাতে সেই তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়। ফলে পৃথিবীর গড় বার্ষিক উষ্ণতা কখনও খুব বাড়ে বা কমে না। একেই পৃথিবীর উত্তাপের সমতা বলে।

উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতি: সূর্যরশ্মির ৩৪% ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। একে পৃথিবীর অ্যালবেডো বলে। আগত সৌরকিরণের ১৯% বায়ুমণ্ডল সরাসরি শোষণ করে আর বাকি ৪৭% ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। অতএব শতকরা ৬৬% বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা: গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ বা সিক্স-র থার্মোমিটারের সাহায্যে দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ডিগ্রি ফারেনহাইট এককে প্রকাশ করা হয়।

গড় উষ্ণতা: কোনও স্থানের প্রতি ঘণ্টার উষ্ণতার যোগফলকে ২৪ দিয়ে ভাগ করলে গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। এটি তিন প্রকার।

ক) দৈনিক গড় উষ্ণতা: দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতাকে যোগ করে যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলে যে উষ্ণতা হয় তাকে দৈনিক গড় উষ্ণতা বলে।

খ) মাসিক গড় উষ্ণতা: কোনও মাসের প্রতিদিনের গড় দৈনিক উষ্ণতাকে যোগ করে সেই মাসের মোট দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে উত্তর আসে তাই মাসিক গড় উষ্ণতা।

গ) বার্ষিক গড় উষ্ণতা: ১২ মাসের গড় মাসিক উষ্ণতাকে যোগ করে যোগফলকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে বার্ষিক গড় উষ্ণতা বলে।

উষ্ণতার প্রসর: কোনও নির্দিষ্ট স্থানের বছরের উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের গড় উষ্ণতার বিয়োগফল বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার বিয়োগফলকে উষ্ণতার প্রসর বলে। এটি দুই প্রকার হয়—

ক) দৈনিক উষ্ণতার প্রসর: কোনও স্থানের একটি দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিয়োগফলকে দৈনিক উষ্ণতার প্রসর বলে।

খ) বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর: কোনও স্থানের বছরের সর্বোচ্চ গড় মাসিক উষ্ণতা থেকে সর্বনিম্ন গড় মাসিক উষ্ণতাকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল হল গড় বার্ষিক উষ্ণতা।

বায়ুমণ্ডলের তাপের তারতম্যের কারণ: যার উপরে বায়ুমণ্ডলের তাপ নির্ভর করে সেগুলি হল—

ক) অক্ষাংশ: নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে, তাই এখানে গরম বেশি বলে

উষ্ণমণ্ডল তৈরি হয়েছে। মধ্য অক্ষাংশে তীর্যকভাবে পড়ে বলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আর দুই মেরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি খুব সামান্য পড়ে বলে এখানে হিমমণ্ডল তৈরি হয়েছে।

খ) উচ্চতা: উচ্চতার উপর বায়ুমণ্ডলের তাপ নির্ভর করে। ট্রপোস্ফিয়ারে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় ৬.৪° করে উষ্ণতা কমে। সেই কারণে পাশাপাশি অবস্থিত দার্জিলিং আর শিলিগুড়ির মধ্যে শিলিগুড়িতে গরম বেশি।

গ) বৈপরীত্য উত্তাপ: উচ্চতা অনুযায়ী তাপের হ্রাসকে স্বাভাবিক উষ্ণতা হ্রাসের হার বলে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে রাতের বেলা পার্বত্য ঠান্ডা বায়ু নীচে নেমে আসে আর উপত্যকার গরম বায়ু উপরে উঠে যায়। ফলে উপত্যকায় ঠান্ডা ও পাহাড়ের উপরিভাগে গরম বায়ু থাকে, একে উষ্ণতার বৈপরীত্য বা বৈপরীত্য উত্তাপ বলে। সেক্ষেত্রে শীতল নিম্নমুখী বায়ুকে ক্যাটাবেটিক বায়ু আর ঊর্ধ্বমুখী উষ্ণবায়ুকে অ্যানাবেটিক বায়ু বলে।

ঘ) স্থলভাগ ও জলভাগের বণ্টন: কোনও স্থান সমুদ্রের কত কাছে বা দূরে তার উপরও উষ্ণতা নির্ভর করে। তাই সমুদ্রবায়ুর অভাবে মধ্যভারতের উষ্ণতা বেশি আর উপকূলের উষ্ণতা প্রায় সারা বছর সমান।

ঙ) বায়ুপ্রবাহ: কোথায় কীরকম বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে তার উপরেও উষ্ণতা নির্ভর করে। যেমন লু বায়ুপ্রবাহের ফলে ভারতে গরমে উষ্ণতা বাড়ে। সেরমই শীতকালে দক্ষিণ তিব্বতে তুষারপাত হয়।

চ) সমুদ্রস্রোত: সমুদ্রস্রোতের ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের উষ্ণতার তারতম্য দেখা যায়। তাই শীতল ক্যানারি স্রোতের প্রভাবে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল।

ছ) ভূমির ঢাল: পর্বতের যে-দিকটা নিরক্ষরেখার দিকে অবস্থান করে সে-দিকের উষ্ণতা তার বিপরীতদিকের অপেক্ষা বেশি হয়।

জ) মেঘাচ্ছন্নতা: যেখানে মেঘ বেশি সেখানে গরম বেশি হয় আর যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে তুলনামূলক ঠান্ডা হয়। সেই জন্য মৌসিনরামে বেশি ঠান্ডা।

ঝ) স্বাভাবিক উদ্ভিদ: যেখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ বেশি সেখানে বৃষ্টি বেশি হওয়ায় উষ্ণতা কম থাকে।

ঞ) ভূমিরূপ: ভূমিরূপ অনুযায়ী উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। তাই সমভূমির উষ্ণতা সমভাবাপন্ন আর পাহাড়ে ঠান্ডা পড়ে।

ট) পর্বতের অবস্থান: পর্বতের অবস্থানের কারণে সাইবেরীয় বায়ু ভারতে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে ভারতের তাপমাত্রার খুব তারতম্য হয় না।

ঠ) মৃত্তিকা: কাঁকড়ময় ভারতীয় মৃত্তিকায় গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশি থাকে। পলিমাটিতে তুলনামূলক কম।

ড) নগরায়ন: নগরায়নের ফলে প্রকৃতির সার্বিক ক্ষতি হচ্ছে, ফলে উষ্ণতা বাড়ছে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি

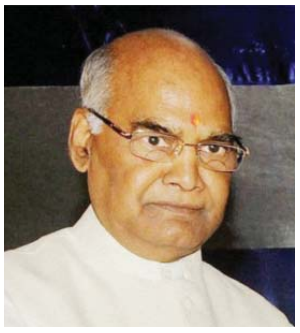

রামনাথ কোবিন্দ (১ অক্টোবর, ১৯৪৫) ২৫ জুলাই ২০১৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়ত্ব গ্রহণ করেন। কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্সে স্নাতক হবার পর আইন নিয়ে পড়াশুনো করেন এবং আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ষোলো বছর ধরে দিল্লি হাইকোর্টে ও সুপ্রিমকোর্টে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করেন। এরপর ১৯৯৪ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রথমবারের জন্য রাজ্যসভায় মনোনীত হন এবং পরপর দু'বার রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল অবধি বিজেপির দলিত মোর্চার সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। এরপর ২০১৫ সালের ৪ আগস্ট তিনি বিহারের রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন তিনি।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী (১০ ডিসেম্বর ১৮৭৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২) হলেন বিশিষ্ট ভারতীয় আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক পদক ভারতরত্ন পেয়েছিলেন। রাজা গোপালাচারী ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প, সাপ্লাই, শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রী হিসাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হিসেবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন।

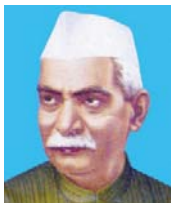

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (৩ ডিসেম্বর ১৮৮৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩) ছিলেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক নেতা ও প্রশিক্ষিত আইনজীবী। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং বিহার থেকে কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক, ১৯৩১-এর লবণ সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারারুদ্ধ করে। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে, তিনি ভারতের গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। গণপরিষদ হল স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক সংসদ, যা ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করে।

সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮-১৭ এপ্রিল ১৯৭৫) একজন ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৯৫২-১৯৬২) এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি পদ অলঙ্কৃত করেন।

রাধাকৃষ্ণন ছিলেন তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর ভারতের সবচেয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিত। তাঁর কর্মজীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকের পদ (১৯২১-১৯৩২) অলঙ্কিত করেন এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৩৬-১৯৫২) প্রাচ্য ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

জাকির হুসেন (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭-৩ মে, ১৯৬৯) ছিলেন ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি। তিনি মে ১৩, ১৯৬৭ থেকে ৩ মে, ১৯৬৯ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল ছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী হুসেন ছিলেন দেশের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি।

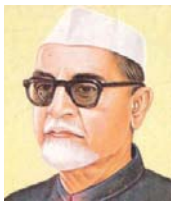

তিনি ১৯৫৬ সালে রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিহারের গভর্নর হিসেবে এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বরাহগিরি ভেঙ্কটাগিরি (১০ আগস্ট, ১৮৯৪-২৩ জুন, ১৯৮০) সাধারণভাবে ভি ভি গিরি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি (২৪ আগস্ট, ১৯৬৯ থেকে ২৪ আগস্ট, ১৯৭৪) ছিলেন। গিরি রাষ্ট্রপতি পদকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে একজন রবার স্ট্যাম্প প্রেসিডেন্ট নামে পরিচিত হন। গিরি তাঁর মেয়াদ শেষে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হন।

ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ (১৩ মে, ১৯০৫-১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭) ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ পুরোনো দিল্লির হৌজ কাজি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ এবং দিল্লি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তারপর দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজ এবং কেমব্রিজের সেন্ট ক্যাথরিন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৯২৮ সালে লাহোর হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন।

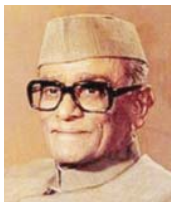

নীলম সঞ্জীব রেড্ডি (১৯ মে, ১৯১৩ -১ জুন, ১৯৯৬) ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন। ভারতের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার আগে, তিনি কংগ্রেস পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৪৬ সালে মাদ্রাজ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হন এবং ১৯৫৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকার ছিলেন।

জ্ঞানী জৈল সিং (৫ মে, ১৯১৬-২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৪) ভারতের সপ্তম রাষ্ট্রপতি (১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত) ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতিবিদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রীপদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মেয়াদকালে অপারেশন ব্লু স্টার, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা এবং ১৯৮৪ এর শিখ বিরোধী দাঙ্গার জন্য কলঙ্কিত হয়েছিল। তিনি ১৯৯৪ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান।

রামাস্বামী ভেঙ্কটরামন (৪ ডিসেম্বর, ১৯১০-২৭ জানুয়ারি, ২০০৯) ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ভারতের অষ্টম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তাঞ্জোর জেলার রাজামাদাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আইন চর্চা করেন। তাঁর তরুণ বয়সে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তিনি গণপরিষদ এবং প্রাথমিক মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি চারবার লোকসভায় নির্বাচিত এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি ভারতের সপ্তম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

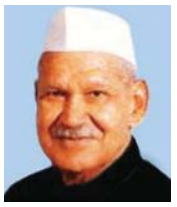

শঙ্করদয়াল শর্মা (১৯ আগস্ট, ১৯১৮-২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯) ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ভুপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫২-১৯৫৬) এবং ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষা, আইন, গণপূর্ত, শিল্প ও বাণিজ্য, জাতীয় সম্পদ ও পৃথক রাজস্ব পোর্টফোলিও বিষয়ক ক্যাবিনেট মন্ত্রীও (১৯৫৬-১৯৬৭) ছিলেন। ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত যোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ফিরে আসেন। ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য ও আইন পেশার প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আইনের 'জীবন্ত কিংবদন্তি' পুরস্কার প্রদান করেন।

কোচেরিল রমন নারায়ণন (১৭ অক্টোবর, ১৯২০-৯ নভেম্বর, ২০০৫) ভারতের দশম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের পেরুমথানমের উঝাভুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (বর্তমান কোট্টায়াম জেলা, কেরল)। কিছুদিন সাংবাদিকতার পর লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি নেহরু প্রশাসনে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের একজন সদস্য হিসেবে ভারতে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি জাপান, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, চিন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশের সেরা কূটনীতিক হিসেবে নেহরু দ্বারা চিহ্নিত হন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অধীনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে নবম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ও ১৯৯৭ সালে দেশের রাষ্ট্রপতি হন। তিনি দেশের এখনও পর্যন্ত একমাত্র দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন।

আবুল পাকির জয়নুল আবদিন কালাম বা APJ নামে পরিচিত আবদুল কালাম (১৫ অক্টোবর, ১৯৩১-২৭ জুলাই, ২০১৫) ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভারতের ১১তম প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন। কর্মজীবনে সফল বিজ্ঞানী থেকে রাষ্ট্রনায়কে পরিণত কালাম তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পদার্থবিদ্যা এবং মহাকাশ প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করেন। পরবর্তী চার দশকে তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান প্রশাসক হিসাবে, প্রধানত প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (ডিআরডিও) এবং ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে ভারতের বেসামরিক মহাকাশ কর্মসূচির এবং সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিলেন। এভাবে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চ গাড়ির প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর তার কাজের জন্য 'ভারতের মিসাইল ম্যান' নামে পরিচিতি পান। তিনি ১৯৯৮ সালে ভারতের পোখরান-২ পারমাণবিক পরীক্ষার জন্য একটি সাংগঠনিক, প্রযুক্তিগতও রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন।

প্রতিভা দেবী সিং পাতিল (জন্ম ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৪) একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ যিনি ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ভারতের ১২ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি ভারতের একমাত্র ও প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি পূর্বে ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত রাজস্থানের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (১১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ জন্মগ্রহণ) ১৩ জুলাই ২০১২ সাল থেকে ২৫ জুলাই ২০১৭ অবধি ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সামলেছেন। ছয় দশকের একটি রাজনৈতিক কর্মজীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর নির্বাচনের পূর্বে, ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি বিদেশমন্ত্রী ও ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ডাকে, রাজ্যসভার উচ্চকক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়ে ১৯৬৯ সালে তিনি রাজনীতিতে আসেন এবং তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ১৯৭৫-১৯৭৭ পর্যন্ত বিতর্কিত অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার জন্য তাঁকে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মতো অভিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৮২-১৯৮৪ সালে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ও ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত রাজ্যসভার নেতা ছিলেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

ক্যুইজ

১) শ্রীমতি বেসান্ত প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্রের নাম কী?
২) জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কোথায় হয়?
৩) জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কোন সালে ঘটে?
৪) স্বরাজ্য দল কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫) স্বরাজ্য দলের দু'জন প্রতিষ্ঠাতার নাম করো।
৬) ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলটির নাম কী ছিল?
৭) সীমান্ত গান্ধী কাকে বলা হয়?
৮) লাল কোর্তা কী?
৯) তিলকের প্রকাশিত দুটি পত্রিকার নাম কী?
১০) 'লোকমান্য' উপাধিতে কাকে ভূষিত করা হয়?
১১) ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির প্রবর্তক কে?
১২) মুসলিম লিগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
১৩) লক্ষ্ণৌ চুক্তি কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়?
১৪) নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৫) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৬) রাইয়ত সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?
১৭) বাঘা যতীন নামে কে পরিচিত ছিলেন?
১৮) আলিপুর বোমা মামলায় কোন দলের বিপ্লবীরা বন্দী হন।
১৯) 'গদর' কথার অর্থ কী?
২০) থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতে কে ছিলেন?
২১) 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার এবং আমরা তা অর্জন করবই...' কার উক্তি?
২২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয়?
২৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারতের বড়লাট কে ছিলেন?
২৪) ক্রিপস মিশন কবে ভারতে আসে?
২৫) ক্রিপস মিশনের প্রধান কে ছিলেন?
২৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
২৭) 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব কবে গৃহীত হয়?
২৮) কে ডাক দিয়েছিলেন, 'করেঙ্গে ইয়ে' মরেঙ্গে'?
২৯) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দুজন বাঙালি নেতার নাম কর।
৩০) 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর দু'জন নেতার নাম করো।
৩১) আজাদ হিন্দ ফৌজ কে গঠন করেন?
৩২) আজাদ হিন্দ সরকার কে গঠন করেন?
৩৩) 'দিল্লি চলো' কার আহ্বান?

৩৪) আজাদ হিন্দ বাহিনীর দু'জন সেনাপতির নাম করো।
৩৫) কবে কোথায় নৌবিদ্রোহ শুরু হয়?
৩৬) নৌ বিদ্রোহের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
৩৭) কে কবে ওয়াভেল পরিকল্পনা পেশ করেন?
৩৮) স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
৩৯) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
৪০) ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য কারা ছিলেন?

উত্তর: ১) কমন উইল ও নিউ ইন্ডিয়া। ২) পঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিওয়ানবাগে। ৩) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। ৪) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ৫) চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। ৬) নওজোয়ান ভারতসভা ও হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। ৭) আবদুল গফফর খানকে। ৮) আব্দুল গফফর খান প্রতিষ্ঠিত 'খোদাই খিদমৎগার' দলের সদস্যরা সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন পোশাক লাল রঙের কোর্তা পরিধান করত বলে এই দল 'লাল কোর্তা' নামে পরিচিত। ৯) 'মরাঠা' ও 'কেশরী'। ১০) বাল গঙ্গাধর তিলককে। ১১) ভগৎ সিং। ১২) আগা খাঁ। ১৩) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে। ১৪) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। ১৫) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৬) অধ্যাপক এন জি রঙ্গ। ১৭) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮) যুগান্তর দলের। ১৯) বিপ্লব। ২০) শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত। ২১) বাল গঙ্গাধর তিলকের। ২২) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর। ২৩) লিনলিথগো। ২৪) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ। ২৫) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। ২৬) চার্চিল। ২৭) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। ২৮) মহাত্মা গান্ধী। ২৯) অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীলচন্দ্র ধাড়া। ৩০) সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয় মুখোপাধ্যায়। ৩১) রাসবিহারী বসু। ৩২) সুভাষচন্দ্র বসু। ৩৩) সুভাষচন্দ্র বসু। ৩৪) জি এস ধীলন ও পি কে সেহগল। ৩৫) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের নৌপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ৩৬) ক্লিমেন্ট এটলি। ৩৭) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন বড়লাট ওয়াভেল। ৩৮) ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ৩৯) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ৪০) স্যার পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, মি: এ ভি আলেকজান্ডার।

জেনারেল নলেজ

আগস্ট আন্দোলন

পটভূমিটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। জাপান যখন অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ভারতের উপর জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনা জোরদার হতে থাকে। সেই সময় ব্রিটেনের মিত্রদের মধ্যে ধারণা হয় যে, নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কারণেই ব্রিটেন ভারতের সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এছাড়াও এসময় কিছু ব্রিটিশ রাজনীতিবিদও ভারতকে স্বশাসন দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। আর সেইসব কারণেই আলাপ-আলোচনার জন্য যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। ভারতে এসে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দর সামনে কিছু প্রস্তাব রাখেন, যাকে ইতিহাসে 'ক্রিপস প্রস্তাব' বলা হয়। কিন্তু ক্রিপস প্রস্তাব বেশ কিছু কারণবশত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। ফলত ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হল।

আর এই ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতের বোঝাপড়া শেষ করে দিয়ে গান্ধিজি তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণ করতে প্ররোচিত করবে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধিজি 'হরিজন' পত্রিকাতে লেখেন, জাপানি আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটেনের উচিত অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করা। ব্রিটেনের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান চাই। ভারতের স্বাধীনতা চাই কেবল ভারতের স্বার্থে নয়— চাই বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং একজাতির উপর অন্যজাতির আক্রমণের অবসানের জন্য। এরপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা অধিবেশনে 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৮ আগস্ট কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গান্ধীজির ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের আইনগত স্বীকৃতি জানায় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে ৯ আগস্ট ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে অতি প্রত্যুষে আন্দোলন শুরু হবে। এই প্রস্তাবে বলা হয় ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা একটি সামরিক সরকার গঠন করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবেন। প্রস্তাব অনুমোদনের পর গান্ধিজি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করব, না হয় মৃত্যুবরণ করব। গান্ধীজির এই উদাত্ত আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের রণধ্বনি ছিল 'করেঙ্গা ইয়ে মরেঙ্গে'।

এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে যথারীতি ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৯ আগস্ট ভোরে গান্ধীজিকে গ্রেফতার করে ও পুনায় আটক করে রাখে। এরপর সর্দার আবুল কালাম আজাদ, জে বি কৃপালনী সমেত বহু প্রথম সারির নেতাকেও কারারুদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি সংগঠন রূপে ঘোষণা করে। সব জায়গায় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়। প্রথম প্রথম এই আন্দোলন ছাত্র-শিক্ষক, যুবসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে তা দেশের শ্রমিক, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। দেশব্যাপী ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এসবের প্রতি সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হলে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ পরিগ্রহণ করে। রেললাইন ধ্বংস, স্কুল-কলেজ বর্জন, বিভিন্ন অফিস-আদালতে অগ্নিসংযোগ, ট্রেন ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, থানা, ডাকঘর, রেজিস্ট্রি অফিস, রেলস্টেশন দখল ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মহারাষ্ট্রের সাতারা, মেদিনীপুরের তমলুক, কাঁথি, দিনাজপুরের বালুরঘাট, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, তালচের, বালাশোর ইত্যাদি। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে সাতারার শ্রীনাথ লালা, নানা পাতিল, বালিয়ার চৈতু পান্ডে, সরযূ পান্ডে, তমলুকের মাতঙ্গিনী হাজরা, সুশীল ধাড়া, পঞ্জাবের গৃহবধু ভোগেশ্বরী ফুকননি, আসামের স্কুলছাত্রী কনকলতা বড়ুয়া অন্যতম। এছাড়া অরুণা আসিফ আলি, সুচেতা কৃপালিনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্রদেব, রামমনোহর লোহিয়া, যোগেশ চ্যাটার্জি, ঊষা মেহেতা, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

বাংলার মেদিনীপুর জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এক গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এর গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল বেশি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাতঙ্গিনী হাজরার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন গান্ধিজির অনুরাগী একজন গ্রাম্য বিধবা মহিলা। মহাত্মা গান্ধি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলে মাতঙ্গিনী হাজরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরার নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ২৯ সেপ্টেম্বর নানাদিক থেকে এসে তমলুক থানা ও আদালত অবরোধ করেন। ৭৩ বছর বয়স্কা কৃষকবধূ মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুক আদালত শীর্ষে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলতে গিয়ে ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ হারান। মাতঙ্গিনী হাজরার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার ধাড়া ও সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে লালবাড়ির দখল নেওয়া হয় ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর তমলুক মহকুমায় 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সরকারি দমননীতির প্রচণ্ডতা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট গভীর রাতে গান্ধীজি সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর ৯ আগস্ট ভোরবেলা খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশজোড়া স্বতঃস্ফূর্ত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি, নাগপুর, আহমেদাবাদ, বরোদা, ঢাকা প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মিছিল, মিটিং, পিকেটিং ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে বিস্তার করলে জনতা সরকারি টেলিগ্রাফ, রেলপথ প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর প্রবল আক্রমণ শুরু করে। থানা, অফিস, আদালতের ওপর ক্রুদ্ধ জনতা চড়াও হয়। গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন বেশি গভীরে প্রবেশ করেছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও এই আন্দোলন সর্বাত্মক আকার ধারণ করে। উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারের কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশ কনস্টেবলরাও চাকরি ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতবাসী এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় সংকল্পের কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ সরকার নেতৃত্ববিহীন ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে স্তম্ভিত হয়েছিল এবং উপলব্ধি করেছিল ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য শাসনের অবসানের আর বেশি দেরি নেই। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়।

এরপর পরের পাতায়

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০১৭

আগস্ট আন্দোলন

আগের পাতার পর

স্বাধীনতা সংগ্রাম যে জয়যুক্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। যথেচ্ছ খুন, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, নারীদের উপর অত্যাচার করে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছিল। সরকারি দমননীতির ব্যাপকতায় আগস্ট আন্দোলন তার গতিবেগ হারিয়ে ফেললেও, এই আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলন প্রমাণ করেছিল যে, স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত এবং তা অর্জনের জন্য সবরকম অত্যাচার, চরম লাঞ্ছনা এমনকী মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত।

মাস্টারদা সূর্য সেন

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রয়েছে বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের কথা। যাঁদের সংগ্রাম, যাঁদের লড়াই আমদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাঁদের মধ্যে মাস্টারদা সূর্য সেন অন্যতম। তিনি 'যুগান্তর' দলের চট্টগ্রাম (বর্তমানে বাংলাদেশে) শাখার প্রধান ছিলেন। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন এর প্রধান সংগঠক। তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। পুরো নাম সূর্যকুমার সেন। ডাক নাম কালু। বাবা রাজমনি সেন এবং মা শশীবালা দেবী। স্থানীয় দয়াময়ী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় তারপর ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন।

সময়টা ১৯০৫ সাল। সূর্য সেন যখন নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। তখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। ক্রমে এই আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯১৬ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বিএ পড়ার সময় তিনি তাঁর এক শিক্ষক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত হন। অধ্যাপক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'যুগান্তর' নামক বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটা বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। সূর্য সেন ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে ফিরে বিপ্লবী যুগান্তর দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এরপর তিনি 'ন্যাশনাল স্কুল'-এ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষকতা করার কারণে তিনি পরিচিত মহলে 'মাস্টারদা' আখ্যা পান। চট্টগ্রামে তখন বিপ্লবী দলে কাজ করতেন আম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেন, চারুবিকাশ দত্ত সহ আরও অনেকে। কিন্তু তাঁদের তৎপরতা ছিল সীমিত পর্যায়ের। বাংলাদেশে বিপ্লবীরা তখন অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। বহরমপুর থেকে ফিরে এসে সূর্য সেন যুগান্তর দলের সংগঠনটিকে সক্রিয় করে তোলেন এবং বিবাদমান দল দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

ক্রমে তাঁর দলই চট্টগ্রামে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ছাত্ররা ক্লাসবর্জন সহ সভা-সমাবেশ করে। সভায় সূর্য সেন তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আফ্রিকা থেকে এসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষ উজ্জীবিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালত বর্জন, সভা-সমাবেশ বক্তৃতা-সহ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

এই সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজের শ্রমিকদের সফল ধর্মঘট এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন সিলেট ও কাছাড়ের চা বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘট আর তার সাথে চাঁদপুরে ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর পুলিশ এবং গোর্খা সৈন্যদের গুলিবর্ষণে অনেকের হতাহত হওয়ার ঘটনা। এ ঘটনার প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট শুরু হয়। এর ফলে চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শেখ-ই-চাটগ্রাম কাজেম আলি মাস্টারের পাশাপাশি মাস্টারদা সূর্য সেন-এর নামও ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং দেওয়ানবাজার এলাকায় 'সাম্যশ্রম' নামের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকেই কংগ্রেসের কাজ ও গোপনে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গান্ধীজির স্বরাজ অর্জিত না হলেও বাংলার বিপ্লবীরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে সংকল্পবদ্ধ হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। বিপ্লব পরিচালনার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল বলে তাঁরা প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চট্টগ্রাম কোষাগার লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে মুক্তি পেয়ে পুনরায়

বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কসরতের নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি নদীতে সাঁতার কাটা, নৌকা বা সাম্পান চালানো, গাছে আরোহণ করা, লাঠি খেলা, ছোরা নিক্ষেপ, মুষ্টিযুদ্ধের মতো শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। চট্টগ্রামে তিনি 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'-এর একটি শাখা গড়ে তোলেন।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এতে সূর্য সেন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। একই বছর ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে একটানা ৬৩ দিন অনশন করে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মারা যান। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় নেতা সূর্য সেন বিপ্লবের পরবর্তী কার্যক্রমের পরিকল্পনা সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেন। এর জন্য তাঁরা 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে হামলার দিন নির্ধারণ করা হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় এর তারিখ পিছিয়ে যায়। এ সময়েই গঠিত হয় সূর্য সেন-এর গোয়েন্দা দল। গোয়েন্দা দলের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তাঁদের প্রস্তুতি চলে। সূর্য সেন গোপনে ইস্তেহার প্রচার করেন। এতে তিনি কৌশল হিসেবে প্রচার করেন যে, ২১ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের গান্ধী ময়দানে বিপ্লবীরা নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্য করবেন। এতে সূর্য সেন সহ আরও কয়েকজন বিপ্লবীর নাম ছাপা হয়।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ফসল। প্রাথমিক পর্যায়ে অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে বিপ্লবের সূচনা হলেও সময়ের ব্যবধানে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হিংসাত্মক কর্মনীতি বা বিপ্লববাদ দেখা দেয়। বিপ্লবীদের কর্মসূচি ছিল: পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার দখল, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ ভবন দখল, ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ, চট্টগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

বিপ্লবীদের ঘোষণাপত্রের প্রথমটিতে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টিতে ছিল দেশের যুবকদের প্রতি রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদানের আহবান। ১৮ তারিখে গুড ফ্রাইডে থাকায় সেদিন ইউরোপীয়ান ক্লাবে ইংরেজ পদস্থ কর্মকর্তারা কেউ উপস্থিত ছিল না। সূর্য সেনের নেতৃত্বে পুলিশের অস্ত্রাগার দখলের পর অস্ত্র ও গুলি সংগৃহীত হয়।

এরপর সূর্য সেন পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। তিনি দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বিপ্লবী দল চট্টগ্রামে গিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। সবাই এতে একমত হলে মাস্টারদা লোকনাথ বলকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রীবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন ও বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল এই সংঘর্ষে ১৪ জন বিপ্লবী শহীদ হন। সূর্য সেন-এর নেতৃত্বে দলটি পাহাড়ে আত্মগোপন করে। এদের ধরার জন্য ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে। সূর্য সেনকে গ্রেফতার করতে না পারলেও সরকার ১৯৩০ সালের ২৪ জুলাই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা চট্টগ্রামের বিশেষ ট্রাইবুনালে শুরু করে। ১৯৩২ সালের জুন মাসে মাস্টারদা প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে বোমা সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম কারাগার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই ঘটনায় ১১ জন বিপ্লবী গ্রেফতার হন। ২৪ সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবে সফল আক্রমণ চালান, তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হন এবং সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনার পরে মাস্টারদা পটিয়ার নিকটে গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের একজন সূর্য সেনের আত্মগোপনের তথ্য পুলিশকে জানিয়ে দেয়। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে একদল গোর্খা সৈন্য গোপন স্থানটি ঘিরে ফেলে। সৈন্যবেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সূর্য সেন ধরা পড়েন। সঙ্গে ছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাসগুপ্ত ও মণিলাল দত্ত সহ আরও কয়েকজন বিপ্লবী।

'যুগান্তর' দলের চট্টগ্রাম শাখার নতুন সভাপতি তারকেশ্বর দস্তিদার সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম জেল থেকে ছিনিয়ে আনার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। তারকেশ্বর এর সঙ্গে আরও কয়েকজনের গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তের বিশেষ আদালতে বিচার হয়। ১৪ আগস্ট সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির রায় হয় এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কারাগারে উভয়ের ফাঁসি কার্যকর হয়।

তাঁদের এই বলিদান ইংরেজদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, এদেশে ইংরেজের অস্তিত্ব আর বেশিদিন নেই। তাঁদের বিভিন্ন আন্দোলন, ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপ ইংরেজের ভিতকে কিছুটা হলেও নাড়াতে পেরেছিল। তাই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সূর্য সেন ও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

তন্ময় মণ্ডল